২

তখন এই অধমকে দক্ষিণ কলকাতা'র ওই গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, কাঁকুলিয়া, ফার্ন রোড, গড়চা ডোভার লেনে কম করে শতকরা ষাট সত্তর ভাগ স্থানীয় ছেলেপুলে'রা এক ডাকে চিনতে পারতো। ১৯৮৯ থেকে নিয়ে ১৯৯১ / ৯২ / ৯৩ ওই বছর তিন চার, বাস্তবিকই ওই দক্ষিনের শহরতলীতে ছিলাম বেশ সুপরিচিত। নামজাদা ও প্রথিত আড্ডাবাজ হিসেবে নাম কিনেছিলাম বলা চলে। আর মিত্রতাও হয়ে উঠেছিল সমাজের নানাবিধ শ্রেণীর তরুণ তরুণীর সাথে। সখ্যতার বিস্তৃতি ঘটেছিল পকেটমার, ছেনতাইবাজ, ঘোরমদ্যপ, পাতাখোর, অটোচালক, পান'ওলা, চা'ওলা, ট্যাক্সি ড্রাইভার, থেকে নিয়ে বহু সাধারণ গতানুগতিক ও অসাধারণ যুবক যুবতীদের সাথে।

উপরন্তু নিজের সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক পরিধি ছাড়িয়ে মাত্রাহীন রূপে বন্ধুত্ব ও পরম আন্তরিক সদ্ভাব ছড়িয়ে পড়েছিল অপেক্ষাকৃত বিত্তবান পরিবারের ছেলেপুলেদের মধ্যে'ও। এমনকি আপমার্কেট আয়রনসাইড রোড, ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্স, বালিগঞ্জ প্লেসের বেশ নামকরা বড়ঘরের ছেলেরাও নিয়মিতরূপে যোগাযোগ ও ফোনালাপ করত। মুলত গড়িয়াহাট রোডের হংকং ব্যাঙ্কের সিঁড়িতে, অথবা একডালিয়া এভারগ্রিন ক্লাবের সামনে রোববার রোববার সন্ধ্যে করে বসত এই বড়লোকী বৈঠক। মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে, নিখাদ ঢপ দিয়ে বলে যেতুম চৈতন্য লাইব্রেরিতে বই দেখতে যাচ্ছি। আমার জনাতিনেক বাল্যবান্ধবীও সামিল হত ওই রোববারগুলি, আমার মালদার বন্ধুদের সান্ধ্য আসরে। তাদের যোগ দেওয়ার কারণ অবশ্য ভিন্ন। বিলক্ষণ জানতুম ওদের উদ্দেশ্য ওই সুদর্শন, রূপবান ও সম্পন্ন ঘরের প্রেমিক জুটিয়ে নেয়া অথবা নিতান্ত আদুরে প্রশ্রয় অর্জন করা। বেশ উপলব্ধি করতে পারতুম, আর কিছুই নয়, নিজেদের ভবিষ্যত কে নিশ্চিত, নিরাপদ ও নিরুপদ্রব করতে দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে উঠেছে ওই মেয়েগুলি। এদিকে আমার বাল্যবান্ধবী নিত্যিনূতন প্রেমিক জুটোচ্ছে, আর আমি ওই রোববারের ঘোর সন্ধ্যেবেলা'য় একটুও ঈর্শান্বিত হয়ে পড়তাম না বললে, মেকি ও ইচ্ছাকৃত মিথ্যেভাষণ করা হবে। তবে কিছুই করারও ছিলোনা আমার, করতামও না বিশেষ কিছুই, কেবল প্রথমটায় সামান্য বিচলিত ও সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। তাও বোধকরি খুব বেশী হলে ওই মাস দেড়েকের মত হবে। মা কালীর দিব্যি, তার কম বই বেশি নয়। নিজের কাছে সামান্য পরাস্ত হয়েছিলাম, বড়জোর একটা কি দুটো রোববার। ভাগ্যিশ ওই একটু আধতু জব্দ হয়েই ক্ষান্ত, নয়ত এই অকর্মণ্য, ত্রুটিপূর্ণ বেচারা 'আমি' কি জটিল বিপদেই না পড়তুম, এখনো ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

তা সে যাকেগ যাক.. আমিও টুকটাক নচিকেতা'র জীবনমুখী গানটান শুনে সবকিছু বেমালুম ভুলে চাঙ্গা হয়ে গিয়েছিলুম অচিরেই। ভ্রান্ত দুঃখ চেপে রাখা ওই চরিত্রের অহং দিকটা জন্মসুত্রে বাপজ্যাঠাদের মত হয়নি কিনা। আর মেধা কম হলে, কথায় বলে ছেলেপিলেদের এসব ক্ষেত্রে সুমতি বেশিই হয়। তবে আসল কথাটি সেটি নয়। আসল ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাস্য হল এই অভাবী ঘরের নিঃসম্বল তরুণ যুবকটি ভিড়লো কিভাবে ওই ধনবানদের রোববারের বৈঠকে? অনেক ভেবেছি জানেন.. না আছে রূপ, না ছিল ট্যাঁকের জোর, না জাঁকজমক, না সেরকম কোন খাস বৈশিষ্ট। সম্বল বলতে শুধু ওই কথার পৃষ্ঠে কথা বলা, টুকটাক বাকচাতুর্য্য, রসিকতা আর আসর জমানোর সহজাত ক্ষমতা ও সামান্য মনভুলোনো দুটো চারটে মাঝেমধ্যে সুমন নচিকেতা'র যুগপোযোগী গান গেয়ে ওঠা। তার জন্যে এত খ্যাতি? এই মধ্যবয়সে পৌঁছেও তার কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি।

একটা নেহাত কল্পনাবিলাসী অথচ সমীচীন কারণ থাকলেও থাকতে পারে এই খ্যাতির পিছনে। সেটি আর কিছুই নয়, আমার অপ্রাকৃত ও বিরল ডাকনামখানি। সব বন্ধুবান্ধবেরই পেল্লায় কৌতুহল ছিল ওই ‘পটাং’ নামটি নিয়ে। সঙ্গতিহীন বন্ধুগুলির চেয়ে বড়লোক বন্ধুদের আমার ডাকনামটি নিয়ে অনুসন্ধিৎসা ছিল ঢের বেশি। পটাং আসলে কে, ম্যানড্রেক নাকি ক্যাপ্টেন হ্যাডক? সত্যিই, আজ অবধি এমন অদ্ভুত লক্ষণীয় নাম কারোর শুনতে পেয়েছি বলে তো মনে পড়েনা। এই বয়সেও যারা নতুন করে ওই পটাং নামটি শোনেন, আমার অতি সাধারণ অবয়ব দেখে তারাও বেশ বিস্মিত হয়ে যান। তাই তো এখন নতুন কোন লোকের সাথে আলাপচারিতায় আমার ওই সুবিদিত ডাকনামখানি যথাসম্ভব গোপনই রাখি।

তবে দক্ষিণ কলকাতায় একদা বিখ্যাত পটাং নামটিতে বাবা মায়ের কৃতিত্ব নেই কিচ্ছু'টি। ও নাম তাঁদের দেয়া নয় মোটেই। ও নামে ডাকতেন আমাকে, আমার চরম শ্রদ্ধাভাজন ও স্বর্গত জ্যাঠামশাই। উনি ছাড়া আমার ছেলেবেলায়, আমার বাকী নিকটাত্মীয়রাও কেউই ও নাম সচরাচর মুখে আনতেন না। এমনকি আমার জেঠিমা ও দিদিও আমার মায়ের দেয়া অতিমাত্রায় বস্তাপচা নাম

‘বাবু’ বলেই চালিয়ে দিতেন। আর এখনও তাই চলছে। ১৯৮৪ তে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি এসে, জ্যাঠার নিজস্ব খ্যাতির জেরে তবেই ও নাম খ্যাতি পায়।

নব্বুই শতাংশ বাঙালী মায়ের মত, আমার মা তো বাবু বলে ডাকতেনই, এখনও তাই ডাকেন। বাবা অবিশ্যি তাঁর দে'য়া 'আলিবাবা' নামক আদরের নামটি ভুলে মেরে দিয়েছেন। উনিও দরকার হলে এখন বাবু বলেই সেরে নেন। ভাগ্যিশ ওই দুর্লভ আরব্যরজনী মার্কা নামে বাবা আর ডাকেন না আমাকে, নয়তো আমার মত একটি মুশকো মধ্যবয়সী বাঙালী ভদ্রলোকের নিরিখে আলিবাবা নামটি বেশ রহস্যময় ও ছম্ছমে শোনাবে বলে আশঙ্কা হয়। তবে ছেলেবেলায় বাবাপ্রদত্ত ওই নামটি নিয়ে বেশ আত্মাভিমান অনুভব করতাম। আমার জীবনসঙ্গীনীটিও যদ্দুর শুনেছি আমাকে বাবু বলেই পিছনে ডাকেন। তা উনি যদি এ বয়সে গোপনে ‘আলিবাবা’ বলে ডাকতে শুরু করেন, রোববারের রাতের দিকে, তা নেহাত মন্দ হবেনা।

মামাবাড়ীতেও ডাকনাম ছিল বাবু, নিজের মাসি'রাও ওই প্রথাগত বাবু নামেই ডাকতেন, এখনও ডাকেন। অন্যদিকে, আমার বৃহত্তর মামাবাড়ীতে অতিরিক্ত মাত্রায় বিদগ্ধ ও রসিক এবং অনাবশ্যক ঠাট্টাবাজ আমারই কিছু সমবয়েসী দুরসম্পর্কীয় মামা মাসি, আমার নাদুসনুদুস মেদপ্রবণতা দেখে, কোন জমায়েত টমায়েত হলেই আদর করে হাতি টাতি গোছের কিছু একটা নামে ডেকে, নিজেরা খুব প্রহসন টহসন করতেন বৈকি। অবশ্য পরের দিকে ওই দুরসম্পর্কীয় মামা মাসি'দের সাথে সখ্যতা খুব গাঢ় হয়েছিল।

আমার বাবার দিকের আত্মীয়রা অনেকেই থাকতেন আসানসোল বার্ণপুরে। ন'মাসে ছ'মাসে বাবা মা'য়ের সাথে সেখানে বেড়াতে গেলে, নাম হয়ে যেত বাবু'র পরিবর্তে ‘বাজু’। ও নামটি দিয়েছিলেন আমাকে আমার স্বর্গত ঠাকুমা। উনি চলে যাবার পর, নামটি চালু রাখেন বার্ণপুরে বসবাসকারী (অধুনা কলকাতাবাসী) আমার চিনিকাকা। বহুদিন অব্যবহারে সে নামটি এখন একেবারেই প্রাক্তন, হুট করে কেউ ডাকলে, চট করে জবাব দিতে মুশকিল হবে। ক্ষীণ মনে পড়ে, আমার দিদিমা'কে দু একবার আমাকে ‘গেনু’ বলে ডাকতে শুনেছি আর ও'পাড়ায় বেশ কয়েকজন ‘টিকলু’ ও ‘গৌরাঙ্গ’ নামেও ডাকতেন। তবে বেশির ভাগই বাবু।

শ্বশুরবাড়ী'র দিকে অবশ্য আমার স্বর্গত শ্বশুরমশাই ও তাঁর সম্মানীয় আত্মিয়েরা প্রচলিত প্রথানুযায়ী ‘অনির্বাণই’ বলতেন বা বলে থাকেন। আমার শাশুড়ি মা'ও যথেষ্ট নিয়মনিষ্ঠ, উনিও বিধিবৎ আমাকে অনির্বাণ বলেই ডাকেন। কেবলমাত্র আমার অতি প্রিয় ও সুহৃদ শ্যালক ভদ্রলোকটি তার আটপৌরে রীতি অনুযায়ী যা একটু বিধিবিরুদ্ধ। এই প্রবাসে, মুম্বই শহরে উনিই যা মাঝে মধ্যে রোববার সকালগুলিতে মনে করিয়ে দেন আমার জ্যাঠামশাইয়ের দে'য়া সেই কৌতুকাবহ নামখানি। আমার এক সুপরিচিত মুম্বইস্থিত বন্ধুপত্নীও ব্যবহার করেন পটাং নামটি, উনিও এককালে দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন। তবে এই মুম্বইমার্কা ধকলের বাজারে, নাম যাই হোক না কেন, বদনাম যে এখনো হয়নি, তার জন্য ঈশ্বরের পায়ে শতকোটি প্রনাম।

বৃহত্তর মামাবাড়ীটি আমার ছিল রকমারি। মা'য়ের নিজের আপন ভাই না থাকায় প্রকৃত মামাবাড়ী বলতে যা বোঝায়, সে হল আমার দাদামশাই, দিদিমা ও দুই মাসি। ওই আটাত্তর নম্বর মহারাজ ঠাকুর রোডের বাড়ীটিই ছিল তাঁদের.. আমার মামাহীন মামাবাড়ী। অবশ্য আদি মামাবাড়ীটি ছিল ঢাকুরিয়া ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে, বিজয়গড়ে। আগে নিতান্ত একটি শরণার্থী পল্লী হলেও, এখন একটি রীতিমত ব্যস্তসমস্ত জায়গা। কোন পালাপার্বণ ব্যতীত ওই মামাবাড়ীতে যাওয়া আসা হতনা মোটেই। ছেলেবেলা থেকে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত ওই আটাত্তর নম্বর ঢাকুরিয়ার বাড়ীটিই ছিল আমার শৈশব।

মামাহীন ঐ মামাবাড়ীটিকে আমি দিদুবাড়ি বলতাম। আর দিদুবাড়ি বলতেই মনে পড়ে যায় সেই সুন্দর রোববারগুলি। ছেলেবেলায় রোববারের ছুটি হলেই, সকাল বেলায় বাবার সাথে বাজার-টাজার ঘুরে এসে, একটু নামকেওয়াস্তে হোমটাস্ক করে, বেলাবেলি চৌবাচ্চা'র জমানো জলে, কালচে লাল রঙের গ্লিসারিন সাবান মেখে স্নান করে এক ছুট্টে মার কাছে গিয়ে ভেজা গায়ে দাঁড়ানো। লাল টুকটুকে গামছা দিয়ে রগড়ে রগড়ে গা'টা মুছিয়ে, পাট পাট করে ভিজে চুলগুলো সাবধানে আঁচড়িয়ে, মা মুখে খুব আচ্ছা করে লাগিয়ে দিতেন শীতে চার্মিস ক্রীম নতুবা গরমে কিউটিকুরা পাউডার। বিশেষত শীতকালে, হাতেপায়ে আচ্ছাসে লাগিয়ে দিতেন ওষুধের দোকান থেকে কিনে আনা জল মেশানো গ্লিসারিন। তারপরে যে কোন একটা জামার উপর চড়িয়ে দিতেন নেভি ব্লু রঙের হাতাকাটা ইস্কুলের সোয়েটার... ব্যাস সারাদিনের মনে তৈরি।

আর আমিও কিশোরীবাবুর পুরোনো শিশিবোতলের দোকান হয়ে, রামবিলাসের পানের দোকান থেকে একটু ভাজামৌরি নিয়ে, সুজাতা'র থেকে একটা দশ পয়সাওয়ালা হজিমগুলি হাতিয়ে আর একটু কুমকুম মাসি'দের জানালার উঁকি মেরে, একছুট লাগাতাম দিদুবাড়ির দিকে। শৈশবের একমাত্র 'বন্ধু' যে ওই আটাত্তর নম্বরে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন..

ক্রমশ....